# মহাষ্টমী ও মহসীন সাহেব

**সুমন দে**

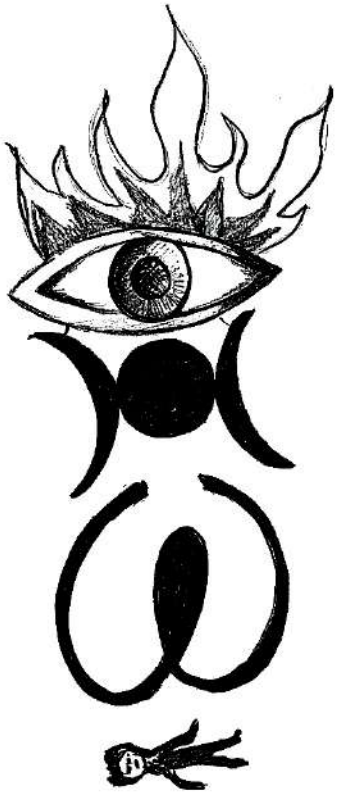

আগে কোনো দিন খাতা ও কলমে আমার আত্মপ্রকাশ নেই।একজন মানুষের জীবন প্রথম থেকে শেষ অবধি একই স্রোতে ধাবমান থাকবে এমনটা ভাবার কোনো কারণ ঘটেনি, বরং এমনটা হলেই একটু আশ্চর্য লাগে, সন্দেহ হয়। চোখের সামনে এমনই অভাবনীয় কিছু ঘটনা ঘটে যায় যার জন্য চিন্তা ভাবনার একটু দিক পরিবর্তন হয়েই যায়। খুব ভালো ভাবেই হয়তো বুঝতে পারছেন আমার কথার অর্থ।

আমার নাম সুমন্ত দেব, একটি বেসরকারি কলেজে সহকারী অধ্যাপকের কাজে নিযুক্ত। যে ঘটনাটি লিখতে চলেছি সেটার কথা ভাবলে এখনো গায়ে কাঁটা দেয়। যাই হোক, আসল ঘটনাতে ফিরে আসি। ঠিক যেমনটা ঘটেছিল, তাই খাতার পাতায় তুলে দিচ্ছি। পুজোর সময়টা আমার ঘরে কম বাইরে কাটে বেশি, সেবারও তাই হলো, আমি, মা আর ভাই সপ্তমীর দিনে সিউড়ির কাছেই একটি প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে পড়েছিলাম। গ্রামের নাম তাজপুর। অদ্ভুতগ্রাম। মানুষজন এমনিতেই কম, তাও যতগুলো মানুষ দেখেছিলাম, সবাই একটু কেমন যেন! যাই হোক গ্রামটিতে কোনো মন্দির নেই, স্বভাবতই সেখানে কোনো পুজো হয় না। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন, মুসলমানদের। আছে একটিমাত্র মসজিদ, পাথরচপুরি মসজিদ। দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ পৌঁছালাম গ্রামে। ভরদুপুর! শীতের হালকা আমেজ আছে, মোটের উপর মনোরম পরিবেশ, বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছি, কোথাও কিছুই ঠাওর করে উঠতে পারছিনা। আমার মা একটু ভয়ে ভয়েই বললেন, “এ কোন জায়গায় এসে পড়লাম রে বাবা! কোথাও কিছুই তো নেই! তোর মাথায় কি অন্য জায়গার নাম এলো না?”

আমি বললাম, যাই বলো মা, একটা নেশা আছে জায়গাটার মধ্যে। একটু দেখিই না ঘুরে, সামনা সামনি কি আছে। একজন আধবয়স্ক মানুষকে জিজ্ঞাসা করলাম সামনে কোনো থাকার জায়গা আছে কি না। বললো সেই মানুষটি যে এখানে একটা দরগা আছে। সেই দরগার সরাইখানাতেই থাকতে হবে। অগত্যা সেখানেই যাওয়া ঠিক হলো। একজন মহিলা সরাইখানার রেজিস্টার নিয়ে এলেন। সেই খাতায় নিজেদের নাম লিখে দিয়ে একটি অন্ধকার ঘরে ব্যাগপত্র রেখে বাইরে যাওয়া স্থির করলাম। সামনে লালমাটি দিয়ে তৈরি রাস্তা, কিছু দূরে ঠিক রাস্তার মাঝখানে মানুষ নামাজ পড়ছেন। একটু অবাক হয়েও নার দিকে এগিয়ে যেতেই সরাইখানার ঐ মহিলা ডেকে বললেন, “কোথায় যাচ্ছ বাবা, এই অন্ধকারে, ভর সন্ধ্যাবেলায় ওদিকে যেও না, জায়গাটা এমনিতেই সুবিধার না”।

“না না, এই সামনে থেকেই একটু ঘুরেই চলে আসবো”, আমি বললাম। ঐ নামাজ পড়া লোকটার দিকে যেতেই উনি বসে থাকা অবস্থাতেই আমার দিকে না ঘুরেই বললেন, “তোর বাড়িতে হাড় আছে, মাটিতে পোঁতা”, আমি বললাম আপনি কে? কী সব বলছেন? আপনি তো আমাকে চেনেনই না, অদ্ভুত ব্যাপার!

এবার লোকটি আমার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন আর হড়হড় করে কিছু কথা বলে চললেন,“তোর নাম জানি, কোথায় বাড়ি জানি, এখানে কি করে এলি সেটা জানি, আর এটাও বলতে পারি যে তোর মা এক্ষুনি অসুস্থ হয়ে পড়বে”। ওনার কথা শুনে পেছন ফিরে দেখলাম মা বসে পড়েছে। মার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতেই বললো,“মাথাটা হঠাৎই খুব ব্যথা করছে, দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না, আমাকে ঘরে নিয়ে চল”। আমি মাকে হাতে ধরে দাঁড় করাচ্ছি, আবার ঐ ভদ্রলোক বলে চললেন, তোর মার ঠিক

পেছনে যে দাঁড়িয়ে আছে , সে কিছু করতে পারছে না কারণ আমি দাঁড়িয়ে আছি তোদের সাথে, ভালো চাস তো দেরি না করে চলে যা এখান থেকে। আমি মাকে নিয়ে সরাইখানার সেই ঘরে ফিরে এলাম।

রাত্রি তখন কটা বাজে জানি না, মনে হলো ঘরের বাইরে কেউ বা কারা যেন ফিসফিস করে কিছু বলছে। ঘরের বাইরে বেরিয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলাম, নাঃ কিছুই তো নেই। ফিরে এলাম ঘরের ভেতর। আবার সেই ফিসফিস আওয়াজ। এবার মনে মনে ভাবছি যে বাইরে বেরিয়ে চেঁচিয়ে কিছু বলবো, দরজা খুলেই ঐ ভদ্রলোক বললেন,"বাইরে ওরা এসেছে, তুই যাবি না বাইরে, বিপদে পড়বি" । সারা রাত না ঘুমিয়েই কাঁটালাম। মাথার মধ্যে অজস্র প্রশ্ন ঘোরা ফেরা করছে। কিন্তু উত্তর একটারও পাচ্ছি না। যায় হোক সকাল হলো, সূর্যের লালিমায় চারিদিক আলো বিচ্ছুরিত, সারা রাতের সেই অভিজ্ঞতার কথা মাথা থেকে যেন উধাও হয়ে গেল। এদিকে মা আমাকে বকাবকি করতে শুরু করেছেন, "দুর্গাপূজার অষ্টমীর দিনে এ কোথায় এসে পড়লাম বল দেখিনি, এ কেমন পাগল ছেলের পাল্লায় পড়েছি! পুজোর সময় কেউ বাইরে থাকে? এই তোর জন্য মায়ের পুজোটাও দিতে পারছিনা। কি যে পাপ করেছি কি জানি"! আমি হাসতে হাসতে একটু দুরে তাকিয়েই দেখলাম, আবার ওই লোকটা রাস্তার মাঝে বসে নামাজ পড়ছেন। সরাইখানার ওই মহিলাকে এবার জিজ্ঞেস না করে পারলাম না। "আচ্ছা উনি কে?" মহিলা কাঁপা কাঁপা গলায় উত্তর দিলেন,"উনি মহসিন সাহেব, এই গাঁয়ের সবাই ওনাকে খুব মেনে চলে। অনেক কে মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচিয়েছেন, কিন্তু উনি নিজে কোথা থেকে এসেছেন কেউ জানে না।

" নাঃ এবার তো ভদ্রলোককে বাগিয়ে ধরতে হয়। ওনার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কেমন আছেন? মহসিন সাহেব" ।

আমার দিকে না তাকিয়েই বললেন, "তোর ব্যাগের মধ্যে যে মাটির পুঁটলি আছে, ওটা নিয়ে আয় আর এক গ্লাস জল আনবি" । আমি অবাক হয়ে বললাম মাটির পুঁটলি, আমার ব্যাগে? আমি কোনো মাটির পুঁটলি টুটলি আনি নি।

উনি বললেন গিয়েই দেখনা, পেলে নিয়ে আসিস। ঘরে ফিরে ব্যাগের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দেখলাম একটা মাটির পুঁটলি। মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, সেটা মা নিজে রেখেছে কি না।

মা বললো, না; তাহলে কে রাখলো?

আমাদের ঘরে আর কেউ কাল রাত্রে এসেছে বলে মনে করতে পারছি না। তাহলে এই মাটি এলো কোথা থেকে। আর মাটির রং কেমন যেন একটু আলাদা। ওই পুঁটলি নিয়ে বাইরে বেরোতে যাবো, ঠিক সেই সময় সেই ভদ্রলোক কড়া নেড়ে বললেন, মাটি আমি আনিয়েছি, ওরা এনে দিয়েছে। বেশি বকবক না করে এক গ্লাস জল নিয়ে আয় আমার সাথে।

বেশ, যেমন কথা তেমন কাজ, এক গ্লাস জল নিয়ে বাইরে এলাম। আমাকে ভদ্রলোক বললেন, ঐ মাটির পুঁটলি থেকে একমুঠো মাটি বের করে হাতে চেপে ধর, গরম লাগলে ছেড়ে দিবি, না হলে হাত পুড়ে যাবে।

মনে মনে ভাবলাম, কী সব বুজরুকি যে শুরু করেছে, ধুর ধুর। এখানে বোধ হয় না এলেই ভালো হতো।

ভদ্রলোক বলে উঠলেন, এখানে এসে পড়েছিস প্রাণে বেঁচে আছিস, বুঝেছিস?

এবার বলেই বসলাম, আপনি কি শুরু করেছেন বলুন তো! এ সব কি? উত্তর এলো একটু পরেই বুঝতে পারবি।

খুব বেশিক্ষন হয়নি, হয়তো তিন-চার মিনিট হবে ডান হাতটা যেন অবশ হবার জোগাড়। মনে হচ্ছে হাতটা ঝলসে যাবে, আর সে কি বিশ্রী গন্ধ, চামড়া পোড়া গন্ধ!

আর না পেরে ডান হাত খুলে ফেললাম। মাটি ঝরে পড়লো নিচে। মহসিন সাহেব এবার চোখ খুললেন বললেন, জলটা ঢেলে দে মাটির ওপর। ওনার কথা মতো ঢেলে দিলাম। আর কয়েক মুহূর্ত পরেই শির দাঁড়া বেয়ে একটা হিম শীতল ধারা বয়ে গেল।

শিউরে উঠলাম, দেখলাম মাটি থেকে গলগল করে রক্ত পড়ছে।

চমকে বললাম, কি এটা?

মহসীন সাহেব বললেন, তোরা তো এসব মানবি না, তাই তোকে চোখে দেখিয়ে দিলাম। আজ রাত্রে তোর বাড়ি যাবো আমি। দুর্গাপূর না... নলহাটি। যেতে পারবি তো? বলেই তাচ্ছিল্য ভরা একটি মুচকি হাসি হাসলেন ভদ্রলোক।

বললাম, পারবো। বলুন কখন যাবেন?

মহসীন সাহেব বললেন রাত্রে।

সকালের এই ঘটনার পর সারাদিন বিশেষ কিছুই করতে ইচ্ছে হল না। আসলে চোখের সামনে এসব, যেন মেনে নিতে পারছিলাম না।

বিকেল সাড়ে পাঁচটায় মা আর ভাইকে নিয়ে মহসীন সাহেবের সাথে চললাম আমার দেশের বাড়ি নলহাটি। রাস্তায় একটি টু শব্দটিও করলেন না ভদ্রলোক। অনেকখানি রাস্তা, তার উপর অষ্টমীর রাত, নিশুতি।

মা পাশে থেকে বললেন, "এই অষ্টমীর ক্ষনে এভাবে! রক্ষা করো মা"।

সত্যিই বলতে রাতটা যেন একটু বেশিই স্তব্ধ।

নলহাটি পৌঁছতে বাজলো রাত নটা।

ভদ্রলোক বললেন, যে কাজ করতে চলেছিস, সেটি করার সময় অনেক কিছু হতে পারে, ভয় পাবি না। আমি আছি, ভয় পেলেই তুই শেষ। মাথায় রোখ চেপে গেছে, বললাম, দেখেই নেব। নিশুতি রাত্রে হেঁটে চললাম বাড়ির দিকে। বাড়িতে দাদু ও ঠাকুমা থাকেন। তারা অবাক যে হয়েছিল সেটা বোঝা গেল তাদের প্রশ্নে।

"কীরে এত রাত্রে কোন ট্রেনে এলি? সব ঠিক আছে তো"? বললেন আমার ঠাকুমা।

— হ্যাঁ, সব ঠিক আছে। আমি বললাম উত্তরে।

এবার মহসীন সাহেব বললেন তাড়াতাড়ি একটা মাটি খোঁড়ার জিনিস জোগাড় করো। না হলে দেরি হয়ে যাবে। এরপর যেসব ঘটনা একের পর এক ঘটতে শুরু হলো তাতে আমি শুধু অবাক না , রীতি মতো ভয় পেলাম। রান্নাঘরের উত্তর কোনের দিকটা খুঁড়তে শুরু কর, আমাকে চমকে দিয়ে বললেন মহসীন সাহেব।

যন্ত্রের মতো কাজ করে চললাম। একটা ছোট সাবোল যে এত ভারী লাগবে, আমি ভাবিনি। মাটি খুঁড়তে শুরু করলাম আমি। একহাত, দেরহাত..

একই রকম ভাবে খুঁড়ে চলেছি আমি।

কোথায় হাড়? কোথায় কী?

কিছুইতো নেই কোথাও। পেছন থেকে চেনা গলায় আওয়াজ এলো, পাবি পাবি..। যা করছিস চুপ চাপ করে যা। ভয় পাবি না। আমি খুঁড়ে চললাম। আর বোধহয় অর্ধেক হাত খুড়েছি, আবার সেই চেনা দুর্গন্ধ, চামড়া পুড়লে যে রকম গন্ধ হয়, ঠিক সে রকম বাজে গন্ধ। আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলাম তার আগেই প্রশ্ন, কিরে পেলি?

বললাম সেই রকম গন্ধ পাচ্ছি। আর কিছুই না।

উত্তর এলো পাবি, খোঁড়।

এবার সত্যিই কারের একটি আধভাঙা হাড় পাওয়া গেল। তুললাম মাটির ভেতর থেকে।

কেন বলতে পারি না , হাড়েরও পর কোনো মাটি লেগে নেই। আমি মাটি থেকে তোলার সময় হাড়টিকে হাত দিয়ে পরিষ্কার করিনি, একথা হলফ করে বলতে পারি।

“পেয়েছিস তাহলে?” বললেন মহসীন সাহেব।

উত্তরে আমি শুধু বললাম, হ্যাঁ। এ দিকে মা আর ঠাকুমা কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে।

মহসীন সাহেব এবার বললেন, “চল আমার সাথে”।

আমার বাড়ি থেকে একটু দূরেই দুটো পুকুর আছে।

তার একটিতে যথারীতি গ্রামের স্নানাদিসারে। আরেকটিতে কেউ যাবার সাহস করেনা। এর কারণ আমার জানা ছিল না এতদিন।

মহসীন সাহেব ঐ নিশুতি রাত্রে আমাকে নিয়ে চললেন দ্বিতীয় পুকুরে।

আমি বললাম ওখানে না যাবার কথা।

উত্তরে উনি বললেন, “আমি আছি তো নাকি?” চলতে থাকে। কোথা থেকে একটা মাটির হাড়ি তুলে নিয়ে বললেন, এটা নিয়ে চল, পেছন ফিরে তাকা বিনা যাই হোক। ফিরে আসবো, পেছন দিকে ঘুরেছি ঠিক এই সময় এক নারী কণ্ঠ।“ আমাকে থাকতে দে এখানেই, তোদের কোনো ক্ষতি করবোনা আমি”।

চমকে পেছন ফিরে তাকাতে যাবো তখনই মহসীন সাহেব হাত ধরলেন।

একজন মাঝ বয়স্ক মানুষের হাত কেন এত ঠান্ডা সেটা বুঝতে পারলাম না। পেছনে কিন্তু সেই নারী কণ্ঠের ডুকরে কাঁদার শব্দ আমাকে তারা করেই বেড়াচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত বাড়িতে ফিরে এলাম। সেই হাড়িতে ওই আধভাঙা হাড়টি ঢুকিয়ে দিয়ে হাড়ির মুখটা আঠা দিয়ে বায়ুরুদ্ধ করে দেওয়া হলো। তার সাথে হাড়ির একটি ছোট্ট ফুটো করে দেওয়া হলো। হাড়ির মাথায় একটি কালো কাপড় দিয়ে বেঁধে দেওয়া হলো। তারপর শুরু হলো মহসীন সাহেবের আর বিমন্ত্র পড়া। শুনে কিছু বোঝা গেলো না বটে কিন্তু আমার গা ছমছম করতে শুরু হলো রীতিমতো। ঠিক কয়েক মুহূর্ত পরে সেই হাড়ির দিক থেকে সেই নারী কণ্ঠের কাঁদার আওয়াজ। ভয়ে আমি দু পা পেছনে চলে গেলাম। হটাৎ সেই হাড়ির ফুটো দিয়ে স্পষ্ট দেখলাম, ভেতরে আগুন জ্বলছে। কিছু বলতে যাবো আমাকে হাত দেখিয়ে থামিয়ে দিয়ে মহসীন সাহেব বললেন, চল। মাটির হাড়ি স্পর্শ করেই চমকে গেলাম। বরফের মতো ঠান্ডা। একটু আগেই যেখানে আগুন জ্বলজ্বল করছিল সেই হাড়ি বরফের মতো ঠান্ডা।হাতে হাড়ি তুলে নিয়ে আবার পুকুর পাড়ে নিয়ে গেলেন মহসীন সাহেব।

বললেন, পুকুরের পশ্চিমে যে অশ্বথ গাছ পাবি, তার গোড়ায় নামিয়ে দিয়ে সোজা চলে আসবে।

ভয় পাবি না। গেলাম, হাড়ি নামিয়ে আসার সময় দেখলাম সেই গাছের গোড়ার মাটিও ঠিক একই রকমভাবে খোঁড়া হয়েছে। সেখানেই হাড়ি নামিয়ে ফিরে এলাম।

মহসীন সাহেব বললেন, ভয় পাসনি তো?

বললাম নাঃ আপনি আছেন তো। এক গাল হেঁসে মহসীন সাহেব পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। আবার সেই ঠান্ডা স্পর্শ। এবার কেন জানি না আমার মনে হলো যেন মাথা থেকে বিশাল বড় একটা বোঝা নেমে গেছে। কথায় কথায় মহসীন সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম একটু সাহস করে, আচ্ছা আপনার হাত এত ঠান্ডা কেন?

উত্তর পেলাম বটে, কিন্তু উত্তর পাবার পরে বুঝলাম পুকুর পাড়ে আমি একা। দূর থেকে চিঁচিঁ করে উত্তর এলো, “আমি আছি না..... আমি ছিলাম”!